ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

আশ্চর্য মাহাত (2026). *মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী

আশ্চর্য মাহাত

গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Email- ascharyamahato@gmail.com

Orcid No- 0009-0007-3216-5933

How to Cite the Article: আশ্চর্য মাহাত (2026). *মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i4.2026.222-233

Keywords	*Abstract*
শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, যুক্তিবাদী, আধুনিক নারী, সম্মান, অধিকার, রাজরানী, বন্যবাসী, বিচক্ষণ, বীরাঙ্গনা	পুরাণে এমন কিছু নারী চরিত্র আছে যাঁদের রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকে লাভ করার বাসনা নিয়ে তাঁদের দাবি পূরণ করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সমৃদ্ধশালী রাজারা। সৌন্দর্যের মোহে পড়ে বিবাহ পূর্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেও পরবর্তীকালে বাস্তবের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে তাঁরা সে কথা মনে রাখেননি। যেমন রামায়ণে রাজা দশরথ বিবাহ পূর্বে কেকয়ীকে কথা দেন যে তাঁর পুত্রকে রাজা করবেন, কিন্তু পরে সেই দাবী তাঁকে কিভাবে আদায় করতে হয় তা আমরা সবাই জানি। শকুন্তলাও সেইরূপ একজন নারী, রাজা দুষ্মন্ত কথা দিয়েছিলেন তাঁরই পুত্র ভবিষ্যতের রাজা হবেন এবং ঋষিকন্যা পাবেন রাজমহিষীর সম্মান। কিন্তু রাজা দীর্ঘ অপেক্ষার পরও ফিরে আসেননি। শকুন্তলা তাঁর অধিকার ফিরিয়ে নিতে পেরেছে এক দীর্ঘ লড়ায়ের মধ্য দিয়ে, যা খুব যে সহজ ছিল তা নয়। তাঁর অধিকার আদায়ের পূর্ব মুহূর্তের কাহিনিকে অবলম্বন করে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' রচনা করেছেন, যা তাঁর "বীরাঙ্গনা" পত্রকাব্যের অন্তর্গত। যেখানে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). *মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

	শকুন্তলাকে আরও বেশি আত্মসচেতন ও আধুনিক করে দেখালেন মধুসূদন দত্ত । অপূর্ব দক্ষতায় সেখানে শকুন্তলাকে তিনি দেখালেন অতি আধুনিকা নারীরূপে। যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের আশা ছাড়েন না, ইতিবাচকতার পথে চলতে এবং তা স্বীকার করতেও দ্বিধা বোধ করেন না, জীবনের আশা সহজে ত্যাগ করেন না। যিনি স্বামীকে তাঁর পরিস্থিতির কথা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে সক্ষম। নিজে সরাসরি পতি নিন্দা না করলেও লোকে যে তাঁর স্বামী সম্পর্কে খারাপ বলছে সমাজ যে তাঁর স্বামী সম্পর্কে খারাপ বলছে তাও সুকৌশলে স্বামীকে বুঝিয়ে দেন তিনি। এই বুদ্ধিমত্তা শকুন্তলাকে এক অন্যরকম তাৎপর্যে মন্ডিত করে। যদিও তিনি পত্রে নিজেকে দাসী, পদযুগলের সেবিকা ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন তবু তার পত্রে এক অপূর্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি।

বহুবিবাহের সমাজে নারীরা ছিল অসহায়। সব সিদ্ধান্তের মূল যখন পুরুষ, তখন মুখ বুজে সব মেনে নেওয়ায় ছিল একমাত্র উপায়। সাধারণ নারীরা অসহায় তো ছিলই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফলাবার ক্ষমতা ছিল না ভারতীয় পুরাণের রাজমহিষীদেরও। ধর্মীয় অনুশাসনে পরিচালিত হতেন তাঁরা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) 'বীরাঙ্গনাকাব্যে' (১৮৬২) সেইরকম এগারোজন পুরাণ মহিষীর প্রসঙ্গ পাই। এই কাব্যে দেখা যায় চিঠি লিখে তাঁরা তাঁদের গোপন মনের চাওয়া-পাওয়া, অধিকার, ক্ষোভ ইত্যাদি ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য রীতিমতো বিদ্রোহ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের আলোকে ভারতীয় পৌরাণিক নারীরা হয়ে উঠেছেন স্বতঃস্ফূর্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রময়ী ও রক্তমাংসের মানুষ। পুরাণে যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন না, বলতে গিয়েও যাঁরা বলতে পারেননি মধুসূদন দত্তের হাত ধরে তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসন ঘুচে গেছে। সেইসময় অর্থাৎ উনিশ শতকে যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ করতে গিয়ে সমাজের কাছে গালাগালি খাচ্ছেন সেই তখনই মধুসূদন দত্ত তাঁর লেখনীর মধ্যে বিপ্লব নিয়ে এলেন। রোমান কবি ওভিডের 'দ্য হেরোয়েডস' কাব্যের আদর্শে রচিত কয়েকজন বীর নারীদের নিয়ে 'বীরাঙ্গনাকাব্য'টি অসাধারণ শিল্পমন্ডিত রূপ নিয়েছে। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে, ভাষার সারল্যে ও চমৎকারিত্বে এক অভিনব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এ-কাব্যের শকুন্তলা একজন অন্যতম চরিত্র। মহাভারতের যুগে তাঁরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা ফলাবার জায়গা ছিল না। কিন্তু মধুসূদন দত্তের শকুন্তলা যিনি ঋষিকণ্যা ও বনবাসিনী হয়েও জনা, কেকয়ী প্রমুখের মতো রাজমহিষী নয় তবুও তাঁদের সমান তালে তাঁকেও বিদ্রোহিনী হতে দেখা যায়। রাজরানীতে অধিষ্ঠিত না হয়েও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনিও বর্তমানের আধুনিকা নারীর মতোই সাহসী। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে শকুন্তলা তাঁর স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ প্রয়োগ করে কিভাবে আধুনিক নারীর মতো আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন সে বিষয়টি আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

ঋষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার তপবনে আসেন। বন্যকিশোরী শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্ত উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গান্ধর্ব্য মতে বিবাহ করেন। এরপর দুষ্মন্ত তাঁর রাজ্যে ফিরে যান এবং কথা দিয়ে যান ফিরে এসে শকুন্তলাকে রানী করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু রাজা আর ফিরে আসেন না। শকুন্তলা বহুদিন স্বামীর কোনো খবর না পেয়ে কষ্টে দুঃখে জীবনযাপন করতে থাকেন। অপেক্ষারত শকুন্তলা একসময় তাঁর সংকটাবস্থার কথা জানিয়ে স্বামীকে চিঠি লিখেছেন। এই পত্রকে কেন্দ্র করেই মধুসূদন দত্তের শকুন্তলা হয়ে ওঠেন যুক্তিবাদী, সচেতন, নির্ভীক ও প্রকৃত এক বীর নারী। মহাভারত ও কবি কালিদাসের নায়িকা শকুন্তলার জন্য সরলা, অপাপবিদ্ধ, নম্র, নির্মলচিত্ত ইত্যাদি বিশেষণগুলিই খাটে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শকুন্তলা' নামক প্রবন্ধে শকুন্তলাকে দুঃখশীলা, নিয়মচারিনী, সংযত, সহিষ্ণু, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী ইত্যাদি নানা সরলতাবাচক বিশেষণে সম্মোধিত করেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা" প্রবন্ধে শকুন্তলা ও মিরন্দা'র তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন–

'... শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দা'র সরলতায় নবীনত্ব ও মাধুর্য অধিক।'[১]

এখানে মিরন্দার সরলতাকে মহত্ব প্রদান করলেও পক্ষান্তরে শকুন্তলার সরলতাও প্রাধান্য পেয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শকুন্তলার সরলতা খর্ব না হলেও তিনি যে অত্যন্ত সচেতন এবং পুরুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারিনী সেই সাক্ষ্য পাওয়া যায় পত্রের প্রতিটি চরণে। এখানে শকুন্তলা বন্যনিবাসী ঋষি কন্যা হলেও অত্যন্ত আত্মসচেতন। বিবাহ পূর্বে রাজা দুষ্মন্ত কথা দেয় যে তাঁদের দুজনের যে পুত্র সন্তানের জন্ম হবে সেই পুত্রই হস্তিনাপুরের পরবর্তী রাজা হবে, তাই আর পিতার আগমনের অপেক্ষা না করে বিবাহে রাজি হন শকুন্তলা। এই ঘটনা আমরা মহাভারতে পাই।

এই আধুনিকা শকুন্তলা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছাড়েন না, ইতিবাচকতার পথে চলতে ভোলেন না, এবং তা স্বীকার করতেও দ্বিধা বোধ করেন না, "জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!"[২] যিনি স্বামীকে নিজের পরিস্থিতির কথা গুছিয়ে বলতে সক্ষম। নিজে সরাসরি পতি নিন্দা না করলেও তাঁর আশ্রম পরিবার তাঁর স্বামী সম্পর্কে মন্দ কথাবার্তা বলছে, এছাড়া গোটা সমাজ যে তাঁর স্বামী সম্পর্কে কুকথা বলছে তা সুকৌশলে স্বামীকে বুঝিয়ে দেন তিনি। এই বুদ্ধিমত্তা শকুন্তলাকে এক অন্যরকম তাৎপর্যে মন্ডিত করে। যদিও তিনি পত্রে নিজেকে দাসী, পদযুগলের সেবিকা ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন তবু তাঁর পত্রে এক দৃঢ়চেতা নারীর প্রকাশ আমরা লক্ষ করি।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

পত্রে দেখা যায় শকুন্তলা তাঁর একাকীত্ব ও প্রতিকূল অবস্থার কথা জানিয়ে তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখছেন। চিঠিতে স্বামীর প্রতি রাগ অভিমান দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কথার বহিরঙ্গে তাঁর সংকটাবস্থার কথা প্রস্ফুটিত হলেও অন্তরঙ্গে তিনি রাজার প্রতি অভিযোগ তুলেছেন। গভীরভাবে উপলব্ধি করলে বোঝা যায় শকুন্তলা মহিষীরূপে রাজভোগ থেকে বঞ্চিত আছেন বলে দুষ্মন্তের প্রতি সমস্ত আক্রোশ উগরে দিয়েছেন —

"বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,

রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,

ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?"[৩]

পত্রের শুরুতেই শকুন্তলার এরকম উক্তি এক বৈপরীত্য চিত্র উদ্ভাসিত করে, বনবাসী দাসী ও অন্যদিকে রাজপদে অধিষ্ঠিত রাজা। শকুন্তলা প্রথমেই কৌশলে রাজাকে মনে করিয়ে দিতে চাইলেন যে, রাজা গান্ধর্ব্য মতে বিয়ে করার পর তাঁকে ভুলে না গেলে তিনি আজ রাজার পাশে বসে রাজমহিষীর সম্মান পেতে পারতেন। কিন্তু আজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এই বৈপরীত্য দশা সৃষ্টির জন্য রাজাই একমাত্র দায়ী। দ্রুত গতিতে চলা বাতাসের শব্দ ও ধুলোরাশি উড়তে দেখলে শকুন্তলা ভাবে রাজা দুষ্মন্তের আদেশে তাঁর লোকজন নানান রত্নে সাজানো হাতি, পদাতিক, সুন্দর রথ, কিঙ্কর কিঙ্করীসহ বিপুল সমারহে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছে। তিনি প্রায়শই এই আশা করে থাকেন বলেই বলেছেন, 'হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!'[৪] শকুন্তলা পত্রের প্রথমে নিজেকে বন নিবাসিনী দাসী বলে চিহ্নিত করলেও তিনি যে রাজমহিষীর সুখ পাওয়ার দাবীদার তা বুঝিয়ে দিতে চাইছেন। এইভাবে বোঝনোর মধ্যে তাঁর শালীনতা ও মার্জিত ব্যবহার যেমন প্রকাশ পায় তেমনি নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বঞ্চিতা শকুন্তলা বনে দিন কাটাচ্ছেন আর তাঁর স্বামী রাজা দুষ্মন্ত রাজভোগে মগ্ন। শকুন্তলার এই দুরবস্থার কথা ভেবে তাঁর পাশাপাশি থাকা পরিজনেরা চিন্তিত। তারা নানা সময় নানাভাবে রাজা দুষ্মন্তকে দোষারোপ করে চলেছেন। শকুন্তলা তাঁদের সেইসব আক্রোশ অভিযোগের কথা অতি কৌশলে পত্রের মাধ্যমে দুষ্মন্তের কানে পৌঁছে দিয়েছেন, যেন স্বামীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে নিজের স্ত্রীকে দূরে রেখে তিনি বড় ভুল করছেন। এমনকি রাজা নিজের ভুল শুধরে না নিলে তাঁর ক্ষতিও হতে পারে এই সতর্কবার্তাও কৌশলে দিয়েছেন। শকুন্তলা সরাসরি স্বামীকে আক্রমণ করছেন না কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় আসলে তাঁর মনে জমে থাকা আক্রোশ উগরে দিচ্ছেন, শুধু মাধ্যম

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

হিসেবে অন্যদের বলা কথা টেনে এনেছেন। বনবাসী শকুন্তলার কষ্ট দেখে রাজার উদ্দেশ্যে বনদেব-এর বলা কথা শুনিয়েছেন,

"নিন্দিছেন বনদের তোমায়, নৃমণি–
কাঁপি ভয়ে–পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।"[৫]

একথা শুনে মনে হয় শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বনদেবে'র শাপের ভয় দেখাচ্ছেন। তিনি স্বামীকে চিঠি লিখেছেন সেখানে নিজের দুঃখের কথা বলেই ক্ষান্ত হতে পারতেন কিন্তু তিনি চান রাজা শাপের ভয় পাক এবং সেই ভয়ে তাঁকে তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দিক। শকুন্তলার এমন কূটনীতি পরায়ণ বুদ্ধি দেখে তাকে একজন চতুরা নায়িকাই বলতে হয়। আবার তিনি তাঁর পালিকা পিসিমার প্রসঙ্গ এনে আরও ভীতি প্রদর্শন করছেন—

"...পিতৃষসা, মনঃ তাঁর রত তপজপে;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এতদিনে!..."[৬]

তিনি এখানে বোঝাতে চাইলেন আশ্রমের পিসিমা নিত্য তপজপে ব্যস্ত থাকেন নাহলে হয়তো এতদিনে রাজার ক্ষতি হতে পারত। রাজার প্রতি তাঁর সখীদের মনের ভাব জানিয়েছেন—

"বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে![৭]"

অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় সখীরা যে তাঁর স্বামী সম্পর্কে বহু নিন্দা কথা বলে যায় তা যেন স্বামীর প্রাপ্য বলেই মনে করেছেন শকুন্তলা। একজন সম্ভ্রান্ত রাজাকে গালাগালি দিচ্ছেন আশ্রমের সামান্য বন্যকিশোরীরা। স্ত্রী হিসেবে শকুন্তলার উচিত ছিল তাঁর স্বামীর কাছে এ লজ্জা গোপন করা। কিন্তু তা গোপন করলে শকুন্তলার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে না তাই আরও বলেছেন—

"... নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়, কি বলো
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে?"[৮]

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

তিনি স্বামীকে বোঝাতে চেয়েছেন সামান্য বনকন্যারাও রাজা দুষ্মন্তের কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে মন্দ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। শকুন্তলাও তাঁদের বারণ করতে পারছেন না কারন সখীরা যা বলছে তার মধ্যে মিথ্যে দোষারোপ তো নেই। আশ্রমের সব সদস্যই রাজার প্রতি রুষ্ট একথা সাহসের সঙ্গে বলেছেন তিনি। তিনি চান এসমস্ত কথা শুনে হলেও রাজা ফিরে এসে তাঁকে রাজপ্রসাদে নিয়ে চলুক। রাজরানীর সম্মান না পাওয়ার নিদারুণ মনঃকষ্ট থেকেই এই বিষয়গুলি উপস্থাপন করা তাঁর উচিত মনে হয়েছে। এখানে নিজের প্রাপ্য সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য শকুন্তলার মধ্যে এক আধুনিক সাহসী নারীকেই আমরা দেখতে পাই।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনি সেই সময়ের রচনা যখন সমাজে নারীদের নিজস্ব কোনো অধিকার চাওয়ার জায়গা ছিল না। প্রভাবশালী রাজারা তাঁদের ইচ্ছামত একাধিক বিবাহ করতে পারতেন। আবার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও রাখাও কোনো দোষের ছিল না। রাজা দুষ্মন্ত শিকার ভ্রমণের সময়কালে হঠাৎ ঋষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বনবাসী শকুন্তলার রূপ মাধুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তারপর শকুন্তলাকে ঘিরে রাজার প্রয়োজন, আকর্ষণ ও প্রাপ্তি চুকে গেছে ওই বন ভ্রমণের মধ্যেই। রাজা যদি শকুন্তলাকে নিজের জীবনের অন্যতম অংশ বলে মনেই করতেন তাহলে তিনি স্বরাজ্যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন না। একজন প্রতাপশালী রাজা সামান্য বনকন্যাকে স্মরণে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি। এ হেন অবস্থায় শকুন্তলাও তার ভাগ্যের পরিহাসকে স্বীকার করে নিতেই পারতেন। কেননা তখনকার সময়ে বহু নারীকে তাদের শোচনীয় অবস্থাকে মুখ বুজে মেনে নিতেই হত। এখনকার আধুনিক মেয়েরা পুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুত ও পরে প্রতারিত হলে আইনি ব্যবস্থার সহায়তার মাধ্যমে নিজের অধিকার বুঝে নেয়। মধুসূদন দত্তের শকুন্তলা সেই সময়ের দাঁড়িয়ে আধুনিক নারীর মত একই কাজ করার পক্ষপাতী। তিনি পত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন রাজা কর্তৃক কৃত বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ সমকালীন কার্যকলাপ। কিভাবে কেমন কৌশলে রাজা তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলেন তারপর বিবাহ করে ফুলশয্যায় শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে রাজা শুধুমাত্র মনোভিলাস পূর্ণ করার অভিপ্রায় নিয়ে ছলনা করে প্রেমের অভিনয় করে গেলেন। তাই শকুন্তলা তীক্ষ্ম বাক্যে লেখা ঝুলি ভর্তি প্রশ্নপত্র রাজার কাছে পাঠালেন, যেন তিনি রাজাকে শোকজ করছেন এরকমই আমাদের কর্ণগোচর হয়—

"...যে তরুর মূলে

গন্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,

যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে–

...হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে?

এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?"[৯]

কিশোরী বয়সে রূপযৌবনে ভরা শকুন্তলার প্রস্ফুটিত অঙ্গের চতুর্দিকে মধুলোভী বন্যভ্রমরেরা ভ্রমণ করত। শকুন্তলা বারবার তাদের তাড়না করলেও তারা ফিরে ফিরে আসত। বিরক্ত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলেও শকুন্তলা তাদের থেকে নিস্তার পেতেন না। দূর থেকে শকুন্তলাকে প্রথম দর্শনকালে এ দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং দুষ্মন্তও। যৌবনের সেই সুবর্ণ সময়ে মধু লোভী অলির মতোই রাজা নিজেকে ধাবিত করেছিলেন শকুন্তলার দিকে এবং তাঁর মধু পান করেছিলেন। বর্তমানে শকুন্তলা মনে করছেন তাঁর সেই রূপ লাবণ্য শুকনো ফুলের

মতো মলিন হয়েছে বলে তাদের সেই প্রথম প্রেমের অনুঘটক অলিরা যেমন তাঁর কাছে আসেনা তেমনি রাজা দুষ্মন্তও আর ফিরে তাকাচ্ছেন না। এই দুঃসময়ের অর্ন্তজ্বালা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে

আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি, —

শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?"[১০]

রাজা দুষ্মন্তের চরিত্রের উপর দাগ দিয়ে শকুন্তলার এরূপ দোষারোপ তাঁর সাহসিকতার পরিচয় দেয়।

শকুন্তলা অরণ্যবাসী, ফলমূল খেয়ে তাদের জীবনযাপন তাই রাজপ্রসাদের সুখভোগ করার ভাগ্য নিয়ে তাঁর জন্ম হয়নি। রাজা তাঁকে বিবাহ করলেও রাজ মহিষীর সম্মান দেননি এই দুঃখও রয়েছে তাঁর। বলেছেন—

"বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,

.....

ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে

শয়ন; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে?"[১১]

কিন্তু তবুও একটুখানি নিদ্রা এলেই দুষ্মন্তের রাজভবনের নানা ঐশ্বর্য ও ভোগ বিলাসের ছবি তাঁর স্বপ্নে ভেসে ওঠে—

"স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

দ্বিরদ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে;

ফুলশয্যা; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী;

কেহ গায়, কেহ নাচে; যোগায় আনিয়া

বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয়

রাজভোগ!"[১২]

শকুন্তলা আশ্রমবাসী ঋষি কন্যা হলেও রাজার স্ত্রী। রাজমহিষী হয়ে রাজভোগের আস্বাদ নেওয়া তাঁর অধিকার। তাই এই অধিকার আদায় করতে তৎপর হয়েছেন তিনি। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে সেই কথা জানাতে ভয় ও লজ্জাকে অতিক্রম করেছেন প্রকৃতির কোলে লালিত আশ্রমবাসী এই নারী।

সন্তানসম ভালোবাসা এবং নিখুঁত লালন পালনের মধ্য দিয়ে পালক পিতা-মাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপন মাতা-পিতা হয়ে ওঠেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই অনাথ শিশু ও পালক পিতা-মাতার মানসিক সম্পর্কের বুনন গভীরভাবে গাঁথা পড়ে। পরবর্তীকালে কোনো কারণে সেই মাতা পিতা ও সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনা হলে উভয় পক্ষই বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর হন। বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেও শকুন্তলা পালিত হয়েছেন ঋষি কণ্ব ও গৌতমী তাপসীর পালনে। তাঁরা শকুন্তলার লালন পালনে কোনোরূপ ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু শকুন্তলা স্বামীকে চিঠি লিখতে গিয়ে সেই গুরুজনদের পর বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরের অন্নে তাঁর জীবন বেঁচেছে বলে মনে করেছেন—

"পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে!

এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,

প্রাণপ্রতি?"[১৩]

আসলে আমরা বুঝতে পারি শকুন্তলা তাঁর পালক পিতা ঋষি কণ্বকে ভালোবাসেন। আশ্রমের সব সদস্য এমনকি প্রকৃতির গাছপালা, পশু-পাখিও তাঁর একান্ত আপন। আসলে নানা কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌশলে তিনি স্বামীকে তাঁর বঞ্চনার কথা বারবার জানাতে চেয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, স্বামীর কর্তব্য ছিল তার অন্ন বস্ত্রের ভার নেওয়া কিন্তু স্বামী সেই কর্তব্য থেকে দূরে সরে আছেন। বিবাহ পরবর্তীতেও তাঁকে পিতার অন্নে প্রতিপালিত হতে হচ্ছে। বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হওয়ার পর একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীর সারাজীবনের অন্ন বস্ত্রের ভারাভার নেন, একথা একজন রাজাকে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

মনে করিয়ে দেওয়ার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছেন তিনি। তিনি যে পিতা মাতার কাছে আশ্রমে হেসে খেলে ভীষণ সুখী ছিলেন এই বিষয়টি আরও ভালো করে বুঝতে পারি যখন বলেন—

"এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,

কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,

নরাধিপ?"[১৪]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে কোনো বৈপরীত্য ভাব প্রকাশিত হয়নি। একদিকে তিনি বলেছেন আপন পিতা-মাতা ত্যাগ করার পর পরের অন্নে পরের প্রতিপালনে প্রতিপালিত বলে তিনি সুখী হতে পারছেন না। কিন্তু তারপরই বললেন রাজা দুষ্মন্ত আসার আগে অবধি তাঁর মনে এক সুখ-পাখি বাসা বেঁধে ছিল। পালক পিতা ও মাতাসম পিসিমাকে পর জ্ঞান করলে শকুন্তলার মনে সুখ-পাখি বাসা বাঁধতে পারতেন না। নিজের স্বামীর প্রতি অভিযোগের বিচিত্র সুর শকুন্তলার বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

শকুন্তলার উদ্দেশ্য একটাই, যেভাবে হোক তার প্রাপ্য মর্যাদা বুঝে নেওয়া কারন তিনি দেবদেবীর কৃপার আশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকার পাত্রী নন। মাইকেল মধসূদন দত্তের এই শকুন্তলা তুখর বাস্তবিক সম্পন্ন চরিত্র। তাঁর পত্রের প্রতিটি লাইনে অভিযোগের সুর শোনা যায়—

"...কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে

তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে!"[১৫]

ডুবে যাওয়ার শেষ মুহূর্তের এক খন্ড তৃণকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার আশা করতে পারে এই দার্শনিক যুক্তি আসলে তাঁর বুদ্ধি দীপ্ততার পরিচয় দেয়। তবে এ কাব্যেরই 'নীলাধ্বজের প্রতি জনা' ও 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রে যথাক্রমে

জনা ও কেকয়ী যেভাবে তাঁদের স্বামীদের সরাসরি তীব্র আক্রমণ তথা অপমান করেছেন তা শকুন্তলা করেননি। পুত্রহন্তা কারীদের প্রতিশোধ না নেওয়ার জন্য রাজ মহিষী জনা তাঁর স্বামী নীলধ্বজকে আক্রমণ করে তাঁর বীরত্বের ওপর প্রশ্ন তুলেছেন—

"কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?"[১৬]

একই রকমভাবে রানী কেকয়ী তাঁর স্বামী দশরথকে পরম অধর্মচারী বলেছেন—

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). ***মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

"...অসত্য-বাদী রঘু-কুল পতি!

নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে!

ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,- গতি অধর্ম্মের পথে!"[১৭]

এই দুই রানী তাঁদের স্বামীদের ত্যাগ করে বনে চলে যাবেন বলে জানিয়েছেন। উনিশ শতকের সেই সময়ে স্বামীরা স্ত্রী ত্যাগ করলেও স্ত্রী'দের স্বামী ত্যাগের দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু এই দুই মহিষী তা করে দেখিয়েছেন। স্বামীদের এরকম ধারালো এবং মানহানিকর বাক্য প্রয়োগ করতে পারার কারণ অবশ্য এঁরা রাজমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু শকুন্তলা এখনো রাজমহিষীর মর্যাদা পাননি। এখনো সেই পদ পাওয়ার ক্ষীণ আশা মনে বাসা বেঁধে আছে বলেই কোমল অথচ তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করে অতন্ত্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন শকুন্তলা। যেখানে তিরস্কার বা অস্বীকারের ভয় নেই। তিনি সত্যবাদী, নব প্রগতির চিন্তাধারায় পুরুষের পাশে বসে নিজ মর্যাদা আদায় করে নেওয়ার পক্ষপাতী বলেই একজন প্রকৃত বীরাঙ্গনা।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। শকুন্তলা-মিরন্দা-দেসদিমনা। সম্পাদনা- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ - আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ. ৭৭

২. দত্ত, শ্রীমাইকেল মধুসূদন। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, বীরাঙ্গনাকাব্য। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, কোলকাতা, ১২৭৫, পৃ. ৮

৩. তদেব, পৃ. ১

৪. তদেব, পৃ. ১

৫. তদেব, পৃ. ৩

৬. তদেব, পৃ. ৫

৭. তদেব, পৃ. ৫

৮. তদেব, পৃ. ৮

৯. তদেব, পৃ. ৫

১০. তদেব, পৃ. ৪

১১. তদেব, পৃ. ৭

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). *মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

১২. তদেব, পৃ. ৬

১৩. তদেব, পৃ. ৭

১৪. তদেব, পৃ. ৭

১৫. তদেব, পৃ. ৮

১৬. দত্ত, শ্রীমাইকেল মধুসূদন। নীলধ্বজের প্রতি জনা, বীরাঙ্গনাকাব্য। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, কোলকাতা, ১২৭৫, পৃ. ৭৫

১৭. দত্ত, শ্রীমাইকেল মধুসূদন। দশরথের প্রতি কেকয়ী, বীরাঙ্গনাকাব্য। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, কোলকাতা, ১২৭৫, পৃ.২৫-২৬

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

সহায়ক গ্রন্থ:

কালিদাস। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। অনুবাদ ও সম্পাদনা - ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা ৭০০০০৬

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। শকুন্তলা-মিরন্দা-দেসদিমনা। সম্পাদনা - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আষাঢ় ১৩৪৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শকুন্তলা। প্রকাশক- রামকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৩

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

আশ্চর্য মাহাত (2026). *মধুসূদন দত্তের 'শকুন্তলা': পৌরাণিক বেষ্টনীতে আত্মসচেতন এক নারী.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 222-233.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। প্রকাশক- রামকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৩

দাস, কাশীরাম। মহাভারত। প্রকাশিত- শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল, অক্ষয় প্রেস, ২৭|৫ নং তারক চাটুর্য্যের লেন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শকুন্তলা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৯১১

আকর গ্রন্থ:

দত্ত, শ্রীমাইকেল মধুসূদন। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, বীরাঙ্গনাকাব্য। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, কোলকাতা, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License